মনে মনে প্রধানমন্ত্রী

আবিদ ইকবাল

Stack Valy

সত্যায়ন
প্রকাশন

যা আছে

জোড়া খুন / ৯

ফন্দি / ৪৫

ছাড় নেই / ৫৫

হিজড়া চেনেন? / ৯০

নাচেরে মিডিয়া নাচে / ৯৯

মাতাল হাওয়া / ১১৪

মাতাল হাওয়া

সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। কলেজের রানির দীঘির পাড়। অন্য দিনগুলোতে এ সময় ভিড় লেগে থাকে। মানুষে গিজগিজ করে। আজ অনেকটাই ফাঁকা। এরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন—নিজে নিজেই জিজ্ঞেস করে ফারিহা। আরও কিছুটা সময় বসে থেকে ফেরার পথ ধরে। ফারিহা থাকে দৌলতপুর। কলেজ থেকে হেঁটে যেতে সাকুল্যে পাঁচ-সাত মিনিট লাগে। ওর একটা রুটিন হলো, যত কাজই থাকুক সন্ধ্যার পরে কখনো বাইরে থাকে না।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরেজি বিভাগে পড়ে ফারিহা। এবার তৃতীয় বর্ষে পা রেখেছে। বাড়ি ছেড়ে প্রথম যেদিন কলেজে পাড়ি জমায়, মা তার কাছ থেকে তিনটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। প্রথম প্রতিশ্রুতি : সন্ধ্যার পরে কখনো বাইরে থাকা যাবে না। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি : কখনো বোরকা আর নিকাব ছাড়া যাবে না। তৃতীয় প্রতিশ্রুতি :

সব সময় চোখ-কান খোলা রেখে চলবে।

সেদিন থেকে মায়ের তিনটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে ফারিহা। তবে মায়ের তিন নম্বর কথাটি এখনো ওর কাছে বেশ রহস্যময় লাগে। দার্শনিক উক্তির মতো মনে হয়। তিনটা বছর কেটে গেল কলেজে। কই, কোনো স্যার তো এমন করে বলেননি। কোনো ম্যাডাম তো ওভাবে বলেননি। মা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। হাল আমলে যেটাকে শিক্ষার কাতারেই গোনা হয় না। অথচ তিনি কেমন করে জানলেন, আজকাল বাঁচতে হলে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হয়?

ফারিহা চলতে-ফিরতে সব ক্ষেত্রে মায়ের ওই কথাটির সত্যতা টের পায়। একজন নারীর জন্য কত রকমের ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে, কত দিক থেকে হায়েনা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে, তা ভেবে কূলকিনারা করা সম্ভব নয়। যেন সুযোগ পেলেই খামচে ধরে নিয়ে যাবে। এটা ফারিহা যে কেবল অনুভব করে তা নয়। চোখের সামনেও ঘটতে দেখেছে। প্রতিনিয়ত ফাঁদে আটকা পড়ছে একটার পর একটা ছাত্রী, গার্মেন্টস কর্মী, নারী-চাকুরিজীবী। ভাবতে গেলে ফারিহার গা শিউরে ওঠে। ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। গলায় আঠার মতো কী যেন আটকে থাকে। ফারিহা ঢোক গিলতে পারে না।

তিনতলা একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে ফারিহারা।

ক্যাম্পাসে মেয়েদের জন্য একটা মাত্র ছাত্রীনিবাস—ফয়জুন্নেসা হল। কলেজে ছাত্রীসংখ্যা যেখানে কম করে হলেও ১০ হাজার, তার ভেতর হলে থাকার সুযোগ পায় মাত্র শ পাঁচেক। বাকি সবাই থাকে কলেজের বাইরে, কয়েকজন মিলে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। ফারিহাদের মেসে ওরকম ছয় বান্ধবী একসাথে থাকে ওরা।

আজ পৌষের ১০ তারিখ। শীতের শুরু বলা যায়। শহরের উত্তর দিক থেকে হিমেল হাওয়া বইছে। মনে হচ্ছে এবার ভালো শীত পড়বে। একবার সন্ধ্যা পড়লে হিম বাতাসের তোড়ে আর বাইরে থাকা যায় না। ঠান্ডায় হাত-পা জমে আসে। ফারিহা টিউশনি শেষ করে যখন মেসে ফিরল, ততক্ষণে দূরের কয়েকটি মসজিদে মাগরিবের আযান পড়েছে। বাকিদের ফেরার নাম নেই। কখন ফিরবে তা অনুমান করা শক্ত।

ওরা যতক্ষণে মেসে ফিরল তখন ঘড়ির কাঁটায় ৯টা ২৫। এরকম ভর শীতে এতক্ষণ বাইরে থাকে কেউ? বিড়বিড় করতে করতে দরজা খুলল ফারিহা।

একেকজনের হাতে চার-পাঁচটা করে শপিং ব্যাগ। কেনাকাটা করতেই বাইরে গিয়েছিল ওরা। ফ্রেশ হয়ে নিল সবাই। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে গোল হয়ে খাটে বসল বান্ধবীরা। শপিংয়ের প্রদর্শনী হবে। ফারিহাকেও টেনে বসানো হলো খাটে। ওর কাজ কার ড্রেস কেমন

এক রকমের প্রধান চাওয়া। মডার্ন পোশাক না পরলে নিজেকে কেমন যেন দলছুট দলছুট মনে হয়। অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় কাজ করে। এসব ভেবেই ফারিহার মেসের চার বান্ধবী জিন্স-টপস কিনে এনেছে।

মৌরির ছোট বোন এসেছে আজ। ওর নাম রূপা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে পড়ে। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাই বোনের কাছে বেড়াতে এসেছে। রূপা এর আগে কখনো কুমিল্লা আসেনি। প্রথমত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ দেখবে। এর বাইরেও ময়নামতি, লালমাই পাহাড়, শালবন বিহার ঘুরে দেখবে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা শেষ। এবার গল্প-আড্ডা দেওয়ার পালা। সবাই বসল গোল হয়ে। রূপা, মৌরি, তানিশা এবং অন্যরা। ফারিহাকেও বসানো হলো জোর করে। আলাপের দাঁড় বাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে রূপার কাঁধে। রূপা কথা বলায় সরেস।

ওদের আলাপের কোনো দিক-বেদিক নেই।

কোথা থেকে শুরু, আর কোথায় গিয়ে শেষ—তা কেউ জানে না। এর ভেতরে রূপার কাছে একটা ব্যাপার নিয়ে জানতে চাইল ফারিহা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগেরই এক শিক্ষক তার ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে। এ নিয়ে তো সারাদেশ তোলপাড়। ঘটনাটা আসলে কী?

রূপা ওই ঘটনার সবটাই জানে। এটা ওর ডিপার্টমেন্টের ঘটনা। তা ছাড়া ভুক্তভোগী মেয়েটি ওর পরিচিত সিনিয়র আপু। বেশ ভালো সম্পর্কও তার সাথে। ওই আপুর কাছ থেকে যা যা শুনেছে, রূপা হুবহু তা-ই বলল—

'আমাদের ড. মাহাবুবুল মতিন স্যার। আমি তার তত্ত্বাবধানে জৈব রসায়নের ওপরে একটা থিসিস করছিলাম। থিসিস চলাকালীন তিনি বেশ কয়েকবার আমাকে যৌন-নিপীড়ন করেন। যেমন : মাঝে মাঝে জোর করে হাত চেপে ধরা, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অতর্কিত ও জোর করে স্পর্শ করা, অত্যন্ত অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা। এ ছাড়া গবেষণার জন্য কেমিক্যাল দেবার কথা বলে নানান বাহানায় তিনি আমাকে জোর করে রুমে ডেকে নিতেন। তারপর জাপটে ধরতেন।

৬ জানুয়ারি, আনুমানিক সকাল ১০টা। আমি তখন ল্যাবে বসে কাজ করছিলাম। বলা নেই কওয়া নেই তিনি

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ফারিহার। বাইরে তখনো আলো ফোটেনি। ভীষণ কুয়াশা পড়েছে। ফজরের নামাজ পড়ে কুরআন হাতে নিয়ে বসল। আধাঘণ্টা কুরআন পড়বে। প্রতিদিন পাঁচ আয়াত করে পড়ে। সাথে আয়াতগুলোর অনুবাদও দেখে নেয়। কুরআন-পড়া শেষে রান্না বসাবে। রান্না বলতে—হয়তো একটু ভাজি, আর আটা ছেনে দুটো পরোটা। শীতকালে একটা জিনিস ওর খুব ভালো লাগে। বাজারে তরি-তরকারির অভাব থাকে না। লাউ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, ব্রোকলি, টমেটো—ভাজি করবার জন্য রকমারি সবজি পাওয়া যায়।

শুক্রবারটা ওর অন্যরকম কাটে। পুরো সপ্তাহ ধরে অধীর অপেক্ষায় থাকে এ দিনটার জন্য। শহর থেকে মোটামুটি ১০ কিলোমিটার দূরে আমড়াতলা ইউনিয়ন। ওখানে পথশিশুদের জন্য একটা স্কুল আছে। নাম 'ভোরের পাঠশালা'। ফারিহা ওখানে বিনে-পয়সায় শিশুদের পড়ায়। সকাল আটটায় বের হয়। দুপুর ২টা পর্যন্ত শিশুদের সাথেই কাটায়।

আজও ফারিহা রুটিন-মাফিক বেরিয়ে পড়ল। যাতায়াতের মাধ্যম রিক্সা। ভোরের অন্ধকারে কুয়াশা যতটা বেশি মনে হয়েছে, এখন তেমন মনে হচ্ছে না। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। কুয়াশা আর রোদের মিশেলে শহরটা কেমন টকটকে কমলা রং ধারণ করেছে। শীতের শুকনো বাতাস এসে গায়ে লাগছে। ভালো লাগে ফারিহার। মনটা কেমন ফুরফুরে হয়ে যায়।

'ভোরের পাঠশালা'-তে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাগজে-কলমে ৫২ জন। গড়পড়তায় চল্লিশজন উপস্থিত থাকে। উপস্থিতির সংখ্যাটা খারাপ নয়। সপ্তাহে একদিন ক্লাস বলেই কিনা, ছন্নছাড়া ছেলে-মেয়েগুলোও আড়মোড়া ভেঙে সকাল সকাল ক্লাসে হাজির হয়। 'ভোরের পাঠশালা'য় শিক্ষিকা একজনই—ফারিহা। একাকী ক্লাস নেওয়াটা ফারিহার জন্য আনন্দের। ব্যাপারটা সে দারুণ উপভোগ করে। কারণ—শিশুদেরকে নিজের মতো করে গুছিয়ে নেওয়া যায়। 'ভোরের পাঠশালা'র ক্লাসরুমে ঢুঁ মারলে ভিন্ন কিছু ব্যাপার চোখে পড়বে। অন্য আট-দশটা স্কুলের তুলনায় 'ভোরের পাঠশালা' এখানেই ব্যতিক্রম।

ক্লাসটা দুটো সারিতে ভাগ করা। একদিকের সারিতে ছেলেরা বসে, অন্য সারিতে মেয়েরা। বিনা প্রয়োজনে ছেলে-মেয়েদের ভেতরে কথা চালাচালি

পুরোপুরি নিষেধ। ওদের বয়স আর কতই-বা হবে? ৬ থেকে ১২ বছরের ভেতরে। তবুও এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে রাজি নন ফারিহা ম্যাডাম। ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্য ফারিহাকে আপা বলে ডাকে। আপা ডাকটাই ওর কাছে ভালো লাগে। পোশাকের ব্যাপারেও কোনো আপস নয়। একটা বাচ্চা মেয়েও ছেলেদের গেঞ্জি পরে ক্লাসে ঢুকতে পারে না। ফারিহার কথা একটাই, আমার ছাত্র-ছাত্রীরা হবে পুরুষের মতো পুরুষ, আর নারীর মতো নারী। নারী আর পুরুষ মিলিয়ে কোনো জগাখিচুড়ি হওয়া যাবে না।

আরেকটা ব্যাপারেও ফারিহা সিরিয়াস। ও সব সময় স্টুডেন্টদের 'ছাত্র-ছাত্রীরা' বলে সম্বোধন করে। 'শিক্ষার্থীরা' বলে না। কারণ, ও খেয়াল করেছে, নারীবাদীরা খুব জোরেশোরে একটা কাজ করছে—নারী আর পুরুষের পরিচয়কে এক করে ফেলছে। 'শিক্ষিকা' এখন আর বলে না। পুরুষ-নারী উভয়কেই শিক্ষক বলে। এমনকি 'আদমশুমারি' নামটাও বদলে দিয়েছে। এখন বলে 'জনশুমারি'। অথচ 'আদমশুমারি' শব্দটা শুনতে কত ভালো লাগে। আদম পুরুষের নাম, এ কারণেই নাকি বদলে দিয়ে জনশুমারি করা।

আচ্ছা বলুন তো, দাদা আর দাদিকেও যদি এক করে ফেলা হয়, কেমন হবে তখন? দাদাকেও দাদা

আনতে পান্তা ফুরোয়। কতটা কষ্টেসৃষ্টে সংসারের ঘানি টানেন বাবারা। অথচ এখানে ওরা বাহারি ফ্যাশনের দোকান সাজিয়ে বসে।

ফারিহার ভাবনায় ছেদ পড়ে। মৌরি ওর সামনে একটা মেরুন কালারের টপস মেলে ধরেছে। ঝুলটা টি-শার্টের চেয়ে সামান্য একটু বেশি হবে। পরলে হাঁটুর কমসে-কম ছ ইঞ্চি ওপরে থাকবে। মৌরি বলল, 'বল না এটা কেমন হয়েছে?' ফারিহা তাকিয়ে দেখে চারজনই একটা করে টপস কিনেছে ভিন্ন ভিন্ন রঙের। সাথে আঁটোসাঁটো জিন্স-প্যান্ট। ওগুলো কার জন্য কিনেছে ওরা? কখনো তো টপস আর জিন্স পরতে দেখিনি ওদের। থ্রি-পিস ছাড়া অন্য কোনো ড্রেস পরেছে বলে মনে পড়ে না। মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান বা পার্টিতে হয়তো শাড়ি পরতে দেখা গেছে দুয়েকবার।

ফারিহা জিজ্ঞেস করল,

: এগুলো কার জন্য কিনেছিস তোরা?

চারজন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল,

: আগে বল কেমন হয়েছে?

ফারিহা উদাস ভঙ্গিতে উত্তর দেয়,

: খারাপ না। এখন বল কার জন্য কিনেছিস ওসব?

: কার জন্য কিনব আবার? শপিংয়ে গিয়েছি আমরা, আর কেনাকাটা করব বুঝি অন্য কারও জন্য?

ফারিহা বুঝতে পারে ওদের মাথায় ভূত চেপেছে। অধঃপতনের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা। মৌরি মেয়েটাই একটা সময় অন্যরকম ছিল। কলেজে প্রথম প্রথম বোরকা-নিকাব পরে ক্লাসে আসত। সব সময় মেয়েদের সারিতে বসত। একান্ত দরকার ছাড়া কোনো ছেলের সাথে কথা বলেছে, গোটা ফার্স্ট ইয়ারে এমন কখনো হয়নি। তারপর ধীরে ধীরে সব কেমন যেন বদলে গেল। প্রথমে নিকাব ছাড়ল, তারপর বোরকা, তারপর ধরল থ্রি-পিস। আর এখন তো টপস আর জিন্স-প্যান্ট ধরার প্ল্যান করেছে।

ওদের গায়ে আসলে ক্যাম্পাসের হাওয়া লেগেছে। এই হাওয়া আসে চতুর্দিক থেকে। আমাদের ইংরেজি বিভাগের কথাই বলা যাক। ওই যে রুবাইদা ম্যাডাম আছেন না একজন? মানুষটা কেমন ক্ষ্যাপাটে ধরনের। একটা বিষয়ে তার ভীষণ অ্যালার্জি। বোরকা-পরা মেয়েদের তিনি দু চোক্ষে দেখতে পারেন না। ক্লাসে কোনো মেয়েকে বোরকা-পরা দেখলে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। মাঝে মাঝে দুয়েকজনকে ক্লাস থেকে বেরও করে দিয়েছেন। ভাইভা বোর্ডে নিকাব খুলতে না-চাওয়ায় ডবল জিরো দেওয়ার ইতিহাসও আছে। তার

চুপেচাপে ল্যাবে ঢোকেন। এরপর তার খুব শীত লাগছে, এ কথা বলে আমাকে আচমকা জড়িয়ে ধরেন। প্রথমটায় আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিই। তারপর তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিই। ওই মুহূর্তে আমার ল্যাবমেটরা দৌড়ে ছুটে আসে। সে-যাত্রায় আমি কোনোরকম বেঁচে যাই। এ ঘটনার জের ধরে আমি ও ল্যাবের অন্য মেয়েরা একাকী ল্যাবে না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

এরপর ১৩ জানুয়ারি দুপুর নাগাদ তিনি আমাকে আবার ডাকেন তার রুমে। এবারও সেই কেমিক্যাল দেবার বাহানা। যাহোক, যে-ই আমি ফ্রিজ থেকে কেমিক্যাল বের করতে গিয়েছি, অমনি তিনি আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেন। আমি তাকে ধাক্কা মেরে রুম থেকে বের হবার চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি বল খাটিয়ে দরজা ভেতর থেকে লক করে দেন। এরপর তার হাত ও মুখ দিয়ে আমার শরীরের নানান অংশ ছুঁয়ে উত্তেজনা তৈরি করার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তার সাথে আমার ভীষণ ধস্তাধস্তি হয়। আমি আত্মরক্ষা করে পালিয়ে বাঁচি। আমি সাথে সাথে বিষয়টা ল্যাবের বাকি দুজন মেয়েকে জানাই। তারাও এমন আচরণের শিকার হয়েছে বলে আমাকে জানায়। পরবর্তীতে মতিন স্যার আমাকে ও ল্যাবে-থাকা দুই মেয়েকে তার রুমে ডেকে নিয়ে বিভিন্নভাবে হুমকি দেন। আমরা যাতে বিষয়টা নিয়ে

মুখ না খুলি সেজন্য প্রায় আধাঘণ্টা তার রুমে আটকে রাখেন।'[২৮]

পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের সামনে ঘটনার তদন্ত করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। তদন্তে ওই আপুর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। সিন্ডিকেট সভায় ওই শিক্ষককে স্থায়ীভাবে অপসারণ করা হয়।[২৯]

এর মাঝে মৌরি বলল, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকও তো অনেকটা একই কাণ্ড ঘটিয়েছে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক। সবচেয়ে ভয়াবহ যে ব্যাপারটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো, ওই দরবেশ সিসি ক্যামেরা দিয়ে ছাত্রীদের প্রায়ই দেখত। জুম করে করে দেখত। যেসব ছাত্রী একটু খোলামেলা পোশাক পরত, ক্যামেরায় তার ফোকাস সেসব ছাত্রীদের দিকেই বেশি থাকত।'[৩০]

রূপার লম্বা ঘটনা শোনানোর পর মৌরির এই কথাটা আরেকটু নাটকীয়তা এনে দিয়েছে। সবাই কমবেশি ঘাবড়ে গেছে। তবে ফারিহা কেন রূপার কাছে এসব জানতে চেয়েছিল, তখনো কেউ তা টের পায়নি। রহস্যটা ফাঁস করে দেবার এটাই উপযুক্ত সময়। ফারিহা এবার কথার সুতোটা তার কাছে টেনে নিল। বলল,

মৌরি, তোরা যে গতকাল জিন্স আর টপস কিনে

ছবি দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে?

ফারিহার কথাগুলো ওদের চোখ খুলে দেয়। গা গুলিয়ে আসে। ছিঃ! এমন চরিত্রহীন 'শিক্ষক'দের চোখে মডার্ন সাজবার জন্যই নিজেদের বেশভূষা পালটে ফেলছি? তাদেরকে দেখাবার জন্যই বোরকা ছেড়ে শর্ট ড্রেস ধরছি? নিজের ওপর রাগ ওঠে মৌরির। কান দিয়ে যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাকিদেরও একই অবস্থা।

তানিশা একটু জেদি টাইপের মেয়ে। আচমকা উঠে দাঁড়ায়। প্লাস্টিকের ওয়্যারড্রোব খুলে গতকালের শপিং ব্যাগগুলো হাতে নেয়। তারপর সোজা রান্না ঘরে। ওর হাতে দেশলাই বক্স। তানিশা কোন কাণ্ড ঘটাবে কে জানে! ও সবার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছাদে। ঘন কুয়াশায় সমস্ত তল্লাট ঢাকা পড়েছে। ছাদটাকে মনে হচ্ছে মাঝসমুদ্রে ভাসতে থাকা একটা জাহাজের ডেক। কাপড়গুলো জড়ো করা হয় একসাথে। তাতে যোগ দেয় বাকিরাও। দেশলাই কাঠির এক খোঁচায় পুরো ছাদটা যেন জ্বলে উঠল।

জিন্স আর টপসগুলো পুড়ছে দাউদাউ আগুনে। কিন্তু ফারিহারা দেখছে ভিন্ন কিছু। পুড়ছে লোলুপ একেকটা চোখ। ওরা ঘাপটি মেরে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জে। ওরা হায়েনার মতো চোখ পাকায় ক্লাসে, ল্যাবে, গোটা ক্যাম্পাসে।

বলল, দাদিকেও দাদা বলল। এতে পরিচয়টা নষ্ট হবে কিনা? 'তোমার দাদা পান চেয়েছে।' এখন ছেলেটা কার কাছে পান নিয়ে যাবে? এ জন্যই নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় থাকা দরকার। দুনিয়ার সব ভাষাতেই এ পার্থক্যটা আছে।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। জগ, কাপ আর গ্লাস। তিনটা আলাদা জিনিস, আলাদা নাম। চিনতে সুবিধা হওয়ার জন্যই আলাদা আলাদা নাম দেওয়া। কই, এতে তো কারও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এখন কেউ যদি বলে, না, কাপ বেচারা ছোট, ওকে দুর্বল দেখে কাপ বলবেন, তা হবে না। এ অধিকার আপনাদের নেই। এখন থেকে কাপকেও জগ বলতে হবে। গ্লাসকেও জগ বলতে হবে। কেমন হবে ব্যাপারটা তখন? আপনি দোকানে গেলেন কাপ কিনতে। এখন কাপকে যেহেতু কাপ বলা যাবে না, তাই বললেন আমাকে কয়েকটা জগ দেখান। দোকানদার বেচারা আপনাকে কী দেখাবে বলুন? সে তো মুশকিলে পড়ে যাবে। জগ দেখাবে, নাকি কাপ দেখাবে? নাকি গ্লাস দেখাবে? সে তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। নারীবাদীদের এই খেলাটা ফারিহার কাছে হাস্যকর আর বিদঘুটে মনে হয়। দেখেন একটা সহজ বিষয়কে কেমন কঠিন করে ফেলা হলো। ফারিহা চায় না তার ছাত্র-ছাত্রীরাও এরকম মুশকিলে পড়ুক।

নতুন বছর শুরু হয়েছে মাস পেরুল। অথচ পাঠ্যপুস্তক হাতে এসে পৌঁছেছে গতকাল। উপজেলা শিক্ষা অধিদপ্তর মারফত ৫০ সেট বই এসেছে। নতুন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিতর্ক ফারিহার চোখ এড়ায়নি। তা ছাড়া, একটা গবেষণার কাজে বইগুলো ভালো করে পড়তে হয়েছে ফারিহাকে। 'ভোরের পাঠশালা'য় কোমলমতি শিশুদের ওই বই দিয়ে পাঠ দেবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

ফারিহা গবেষণা করতে গিয়ে একটা ভয়ংকর জিনিস উদ্‌ঘাটন করেছে। পাঠ্যপুস্তক রচনার পুরো রোডম্যাপটা ধার করা হয়েছে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে। আমাদের জানা থাকবার কথা, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ১৭টা পয়েন্ট আছে। এর ভেতরে ৪ নম্বর পয়েন্ট হলো : মান-সম্মত শিক্ষা। আর ৫ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে জেন্ডার সমতার কথা। এখন, জাতিসংঘের মাপকাঠিতে যদি বাংলাদেশকে ভালো করতে হয়, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থাটাও জাতিসংঘের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। ওটা না করা হলে সেই শিক্ষা আর 'মানসম্মত' হবে না। এবারের পাঠ্যপুস্তকে ঠিক এই কাজটাই খুব চালাকির সাথে করা হয়েছে।

টুং করে শব্দ পড়ল ম্যাসেঞ্জারে। পরের দুটো ক্লাস হবে না আজ। চার নম্বর ক্লাসটা বিকেল তিনটায়। হাতঘড়িতে তাকাল ফারিহা। কাঁটায় কাঁটায় দশটা বাজে। তার মানে আরও পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে পরের ক্লাসের জন্য। সময়টা কীভাবে কাটানো যায় তা-ই ভাবছে ফারিহা। কলেজ থেকে বেরিয়ে দু কদম হেঁটে ফারিহা এল রানির দীঘির পাড়ে। আজও এখানটা বেশ ফাঁকা লাগছে। এই সময়টা ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে ব্যস্ত থাকে।

বট গাছের গুঁড়িতে বসল ফারিহা। রানির দীঘির পাড়ে এই একটাই বটগাছ। গাছটার বয়স হবে কম করে হলেও দেড়শ বছর। খুবই প্রাচীন। গাছের শেকড়গুলো বিরাট বিরাট। ওরকম একটা শেকড়েই বসে আছে ফারিহা।

মাথার ওপরে আকাশ। নীল-রঙা আকাশ। সেখানে মেঘ উড়ছে। মেঘের ছায়া পড়েছে দীঘির জলে। দীঘির ওপারে খেজুর গাছ। বাবুইয়ের বাসার মতো একটা

রসের হাঁড়ি ঝুলছে তাতে। হঠাৎই এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে গেল। রোদে চিকচিক করছে ডানাগুলো। ফারিহা আনমনে বলল—আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুনিপুণ কারিগর। কত সুন্দর করে তিনি সাজিয়েছেন সব কিছু!

ফারিহা ভাবনায় হারিয়ে যায়। সত্যিই! চমৎকার মহান রবের সৃষ্টি। তিনি সবকিছু বানিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়। কেবল মানুষ নয়। বনের বাঁকে বাঁকে, খাল বা নদীর ধারে দল বেঁধে ছুটে-চলা হরিণ, ঢেউয়ের তালে দুলতে থাকা শালুক, কিংবা মাচার ওপরে হাসতে থাকা ডগডগে লাউ-ফুল—সবই তিনি বানিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়। পুরুষ হরিণ, নারী হরিণ। পুরুষ ফুল, নারী ফুল। মানুষও তা-ই। পুরুষ অথবা নারী। সবকিছু জোড়া করে বানানোর কারণ—তারা যেন একে-অপরের কাছ থেকে আদর-ভালোবাসা পেতে পারে। সুখ-দুখ দুজনে ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

সারা দিন কাজ করে স্বামী যখন বাড়ি ফিরবে, স্ত্রীর মুখ দেখে তার চোখ জুড়াবে। স্বামীকে দেখেও স্ত্রীর মন জুড়াবে। একসময় ঘর আলো করে শিশু-সন্তান আসবে। জগৎ-জোড়া মায়া তার চোখে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর সব সুখ পূর্ণতা পায়।

শিশুটির ঠাঁই হয় মায়ের নরম বুকে। মায়ের গড়নই

এমন। শিশুকে লালন-পালনের উপযোগী করেই মায়ের শরীরটা বানিয়েছেন আল্লাহ। শিশুর খাবারের জোগান মিটবে। সুস্থ থাকার জন্য যতটুকু তাপ প্রয়োজন, তা পাওয়া যাবে মায়ের কোলেই। মায়ের মনটাও কেমন নরম। সন্তান লালন-পালন করার জন্য তাকে রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে কাটাতে হয়। তবুও কোনো রাগ নেই, অভিযোগ নেই। এভাবেই পৃথিবীতে টিকে থাকে মানুষের প্রজন্ম। মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস এমনই। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি কিংবা তারও আগের কোনো প্রজন্ম—এই উপায়েই তারা জীবন কাটিয়েছেন।

মানুষের এই সুন্দর জীবনযাপন পছন্দ হয় না ওদের। শয়তান তো বলেই রেখেছে, তার আদেশে মানুষ বিকৃত করবে আল্লাহর সৃষ্টিকে।[৩২] শয়তানের অনুসারীরাও থেমে নেই। শয়তানের এই 'ওয়াদা' পুরা করবার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছে। এর ফলাফল কী? সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে বিকৃত আচরণ। কিছু কিছু পুরুষ যাচ্ছে পুরুষের কাছে! নারী যাচ্ছে নারীর কাছে!

এ অপরাধের জন্যই আল্লাহ তাআলা লূত আলাইহিস সালাম-এর গোটা জাতিকে মাটির নিচে চাপা দিয়েছিলেন। জমিনটা উপুড় করে ওদের ওপরে ফেলে দিয়েছিলেন।[৩৩] আর কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে নাকি এ কাজে জড়াচ্ছে! ফারিহা দীঘির জলে একমনে তাকিয়ে

মৌরি কাঁদছে। ফারিহার চোখে পানি। ওরা তখনো তাকিয়ে আছে দীঘির জলে। জীবনটা যদি দীঘির জলের মতোই শান্ত হতো। আর মানুষগুলো যদি হতো ফুটন্ত শাপলার মতোই পবিত্র।

মৌরির জন্য আর কী অপেক্ষা করছে, তা আমরা জানি না।

মৌরি কি খুন হবে?